একজন অমিতাভদার চলে যাওয়া

যুবায়ের হাসান

না-তিনি ছিলেন না কোন কেউকেটা, খ্যাতির অলিন্দেও ছিল না তাঁর বসবাস একান্তই আটপৌরে, সাধারণ এক মানুষ, তবু, ...তবুও তাঁকে অল্প সময়ের মধ্যে আর দশজন তেকে আলাদা করে ফেলা যেত। এক অনন্য সাধারণ সরলতা, লব্ধ জ্ঞানের প্রকাশ আর আকর্ষণীয় বাক-ভঙ্গিমার জন্যে কয়েক মূহুর্ত্যের মধ্যে তাঁকে আমাদের মতো আর দশজন থেকে আলাদা করা যেতো। এসব তাঁকে কষ্ট করে অর্জন করতে হয়নি-এগুলি ছিল তার একান্তই স্বত:স্ফূর্ত আর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। আদ্যোপান্ত সুশিক্ষিত (স্বশিক্ষিতও বটে) মানুষটির চলনে-বলনে ছিলনা অহংকারের লেশ মাত্র। আসলে অহংকার, আত্মগরিমা, কপটতা-এসব বিষয় তাঁর জীবন-অভিধানে ছিল অনুপস্থিত। তিনি ছিলেন ভেতরের আলোয় আলোকিত। কাছাকাছি আসলে, সেই দ্যুতি আর আলোকের ঝরনা ধারায় অবগাহন করা যেত। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর সাথে পরিচয় ও বন্ধুত্বের বিষয়টি আমার ব্যক্তিজীবনে এক অমূল্য সম্পদ হয়ে রইলো। আর তা রইলো অনাবিল, অপার আনন্দ ও অভাবিত গভীর বেদনার যুগলবন্দী হয়ে।

সাধারণের মাঝে অসাধারণ এই মানুষটির নাম অমিতাভ চন্দ্র । ঘনিষ্ঠজনের কাছে তিনি শুধুই অমিতাভদা। কোলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গুণী ও জনপ্রিয় এক অধ্যাপক। শুনেছি শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক তাঁর কাছে ছিলো এক ধরনের বন্ধুত্বের নামান্তর। অধীত জ্ঞান বিতরণে তিনি ছিলেন অকৃপণ, আন্তরিক ও শ্রমঘন সচেষ্ট। সাধ্যের বাইরেও পরিশ্রম করতেন অনেক সময়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় তাঁর ছিল অবারিত চলাফেরা। নানামুখী পড়াশোনা (জ্ঞান সাধনাই বলা চলে), প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব পালনের সফল কার্যক্রমের পাশাপাশি চলত অগুনতি সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন আর রাত জেগে লেখালেখি। কতোরকম সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন তা' নিজেও হিসাব করে বলতে পারতেন কী না সন্দেহ। ব্যতিক্রমী প্রতিভাধর মানুষদের স্মৃতি শক্তি নিয়ে যে সব চমকপ্রদ অভিনব কেচ্ছা-কাহিনী শোনা যায়---অমিতাভদা এর বাইরে ছিলেন না, অসাধারণ ছিল তার স্মরণ রাখার ক্ষমতা, কোন কিছু একবার শুনলে তা কখনও ভুলতেন না। সেই সাথে তিনি ছিলেন অসম্ভব বিনয়ী, তার মেধার প্রশংসা করলে সংকোচের হাসি দিয়ে না-না করে উঠতেন।

তাঁর অনেক কাজের মধ্যে প্রিয় কাজ ছিল লেখা-লেখি। বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন ছিল তার মূল গবেষণা ক্ষেত্র। এ বিষয়ে তাঁর রয়েছে প্রচুর মৌলিকা গবেষণা প্রবন্ধ যা বৈচিত্রময় বিষয়বস্তু সমৃদ্ধ। তার লেখা ভারত-বাংলাদেশ উভয় দেশের গবেষকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা কুড়িয়েছে। এ সব লেখা তিনি লিখতেন গভীতর চেতনাবোধ, প্রকৃত তথ্য আর অভিজ্ঞতার নির্যাস মিশিয়ে। তা থেকে বেরিয়ে আসতো বিশ্লেষণধর্মী নিজস্ব আবিস্কার, নিরীক্ষামূলক অভিক্ষেপ। অবশ্য তাঁর অধিকাংশ লেখা প্রবন্ধ-নিবন্ধ আর প্রকাশিত গ্রন্থ সম্পর্কে আমার জানার সুযোগ বেশী হয়নি। তবে বুদ্ধিজীবী মহলের প্রশংসা শুনে তাকে বরাবরই এক খ্যাতনামা পন্ডিত বলেই মনে করার ক্ষেত্রে আমার কোন দ্বিধা ছিল না।

সৃষ্টিশীল মানুষকে ঘেরাটোপে বেঁধে রাখা যায় না। কোন চেনা ছকে পরিচিতিও দেওয়া যায়না--- অমিতাভদা সে-রকমই। চেনা-আধাচেনা এমনকী অশ্রুতপূর্ব কর্মকান্ডেও জড়িত হতে তাই পিছপা হতেন না। নতুন সৃষ্টির মঝেই যে এঁদের আনন্দ। মানব জন্মের সার্থকতা বোধহয় এখানেই।

দুর্ভাগ্য আমারই। অমিতাভদার সাথে আমার পরিচয় ও সম্পর্ক মাত্র চার বছরের। বন্ধু দীপু (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মর্ত্তুজা খালেদ) একদিন সন্ধ্যায় দাদাকে নিয়ে আমার ঢাকা-র বাসায় হাজির হয়। কিঞ্চিত স্থূলদেহী, খাদ্যরসিক মানুষটির অন্যতম দিক-দিগন্ত, অল্পসময়েই প্রকাশিত হতে থাকলো। দীপু গবেষণার কাজে অনেক বছর কলকাতায় থেকেছে, দাদাকে দেখেছে খুব কাছে থেকে। দীপুর কাছেই শুনেছি, দাদার কলেজ স্ট্রীটের পড়ার ঘরটি বই-পত্রে প্লাবিত। হাজারো বই-পুস্তকে তা ছাদকে ছুঁয়ে ক্ষান্ত হয়নি। টেবিলের আশ-পাশ, খাটের তলা, সবই বই-এর দখলে। বই-রাজ্য আর কী তবে খুব আশ্চর্যের বিষয় ছিল এই যে, বন্ধুবৎসল আপ্যায়নপ্রিয়, সজ্জন ও পরোপকারী দাদার কাছে কেউ কোন বই চাইলে এবং সেটি তাঁর সংগ্রহের বইয়ের জঙ্গল থেকে নিমিষে উদ্ধার করে হাতে ধরিয়ে দিতেন। এমনই ছিল তাঁর স্মৃতিশক্তি।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক হয়েও তার প্রিয় বিষয় ছিল ইতিহাস। নিজের একমাত্র কন্যাকেও তাই তিনি উচ্চতর ডিগ্রির জন্য ইতিহাস পড়তে উৎসাহিত করেন। বাংলাদেশের ইতিহাস গবেষণার সাথে যুক্ত সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে তার ছিল ঘণিষ্ট যোগাযোগ। প্রতি বছরই বাংলাদেশের ইতিহাস বিষয়ের আন্তর্জাতিক সেমিনার তিনি আমন্ত্রিত বিদেশী অতিথি হিসাবে যোগদান করতেন। আর এসব সেমিনারে উপস্থাপন করতেন অত্যন্ত ধারালো, তথ্য ও যুক্তিনির্ভর নিজস্ব মূল্যায়নী প্রতিবেদন। নিজে শতভাগ কমিউনিস্ট হয়েও অমিতাভদা ছিলেন একান্তই মানবতাবাদী। ভারতীয় জাতীয়তাবাদে ছিল তাঁর গভীর অনাস্থা। তিনি এই জাতীয়তাবাদের ভিত্তিগত যুক্তিহীনতার কথা প্রায়ই বলতেন। বাংলাভাগের বিষয়টিও তাঁর কাছে ছিল অগ্রহণযোগ্য।

এই ক' বছর মিশে বুঝেছি, অমিতাভদা ছিলেন সম্পূর্ণভাবে সংস্কারমুক্ত, সাম্প্রদায়িতাশূন্য এক মানুষ। বিশেষ কোন ধর্মেও তাঁর বিশ্বাস ছিল না। বিবেক আর মানবতাবাদকে তিনি সবার উপরে স্থান দিতেন। কাশ্মীর, গুজরাট, আসাম, মণিপুর ইত্যাদি রাজ্যের সংঘাত আর বিদ্রোহ নিয়ে তিনি মৌলিক, বিশ্লেষণধর্মী কথা বলতেন। তথাকথিত ভারতীয় আগ্রাসনবাদ আর দখলদারিত্বে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। মণিপুরে 'মনোরমা' নামের মেয়েটির মর্মান্তিক পরিণতির ঘটনায় তাঁকে যার-পর-নেই সংক্ষুব্ধ হতে দেখেছি। পরে তার এক লেখায়ও এসেছে এই নিয়ে তাঁর উত্তুঙ্গ ক্ষোভের বহি:প্রকাশ। তাঁর এরকম চিন্তার স্বাধীনতা ও সৎ-সাহসকে একই সাথে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতাম। মনোরমা-র বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়তেন, আমি তখন আমাদের লজ্জা লুকাতে চাইতাম। সৎ-সাহসের অভাবেই হোক অথবা দেশের সম্মান রক্ষার স্বার্থেই হোক, আমার আর বলা হয়ে উঠতো না এযুগে আমাদেরও একজন মনোরমা আছে--- - যাঁর নাম কল্পনা চাকমা। ভিতরে ভিতরে তিনি আমাদের সব খবরই রাখতেন বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু অপ্রিয় বা বিব্রত হবার প্রসঙ্গের অবতারণা তিনি কখনও করতেন না।

অন্যান্য আর দশটি বিষয়ের মতো বাংলাদেশ সম্পর্কে ছিলো তাঁর অগাধ জ্ঞান ও পড়াশুনা। বাংলার ইতিহাস, সাহিত্য-সংস্কৃতি সব শাখায় তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল। মজা করে বলতেন, "শতভাগ ঘটি হয়েও আমি দাদা, আপনাদের জামাই--- বাংলাদেশের জামাই।" বৌদির পৈত্রিক নিবাস ছিলো ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় তারই সূত্র ধরে তিনি এ দাবী করতেন, আরও বলতেন, "আপনারা জামাই আদরে কার্পণ্য করেন না।"

বছর দু'য়েক আগে বৌদিসহ আসেন বাংলাদেশে। ঢাকার বাইরে সেবার রাজশাহী ও ময়মনসিংহও ঘুরে যান। ময়মনসিংহ গিয়েই খুঁজে খুঁজে তসলিমা নাসরিনের "উত্তাল ফাল্গুনে" বর্ণিত বাড়ী বের করেন। পরে

কোলকাতায় তসলিমা নাসরিনকে তা জানিয়েও ছিলেন। রাজশাহীর বরেন্দ্র অঞ্চলের রাজশ্রী মহিমা তাঁকে মুগ্ধ করেছিলো। আর এ বছর ফেব্রুয়ারিতে তিনি ছিলেন ঢাকার বুকেই। মহান ভাষা দিবস অর্থাৎ একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠান উপভোগ করলেন একান্তই নিজের করে। লক্ষ মানুষ ঠেলে, তাঁর আর সব দেশী বন্ধুকে জনস্রোতে হারিয়ে তিনি শহীদ বেদীমূলে পৌঁছাতে পেরেছিলেন। কথার যাদুতে এদেশের পুলিশও বশ মেনেছে। তাঁর হাতের ফুল শ্রদ্ধাঞ্জলি রূপে যথাস্থানে পৌঁছে গেছে।

বাংলাদেশের বরেন্দ্রভূমিতে স্বস্ত্রীক অমিতাভ চন্দ্র

ফি বছর আমার বাসায় একবার 'হামলা' হতো। 'দাওয়াত' বা 'নেমতন্ন' তাঁর ভাষায় ছিলো 'হামলা'র নামান্তর। দল-বল নিয়েই আসতেন তিনি। যথাযথ ও অত্যন্ত সফলভাষ এ হামলা 'মোকাবেলা'র দায়িত্ব খুশী মনে মেনে নিত আমার স্ত্রী লুনা--- দাদার ভাষায় 'লুনা বৌদি।' একেবারে শিশুর মতো সরল-সাধারণ নির্ভেজাল খাদ্যরসিক এই মানুষটিকে আপ্যায়ন করতে পেরে আমরা সবাই কম খুশী হতাম না। তাঁর ঘোষিত চারজনের অতিথি সংখ্যা শেষমেষ দ্বিগুন হয়ে যেতো। আর সন্ধ্যা থেকে আসি আসি করে আসতেন রাত দশটায়। এসব ছিল তার চিরাচরিত স্বভাব। আত্মভোলা মানুষ যেমন হয় আর কি, আমরা ঘণিষ্ঠজনেরা বিষয়টা খুব উপভোগ করতাম। এসেই একটা বড়ো করে ক্ষমা চেয়ে নিতেন। তার সাথে আসা অতিথি তালিকায় রাওয়ালপিন্ডির মিনহাজ থেকে গৌহাটির উদ্দীপনা গোস্বামী পর্যন্ত অন্তর্ভূক্ত থাকতো। তার ভাষায় তা ছিল "সার্ক ফোরাম," আসলে সঙ্গী-সাথী বন্ধুদের নিয়ে সব আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে চাইতেন। সবাইকেই খুশী দেখতে চাইতেন। এমনই আন্তরিকবোধ ক'জনেরই বা থাকে।

আমিতাভদা ছিলেন একান্তভাবেই বাংলাদেশ প্রেমিক। শুনেছি, কোলকাতায় তাঁর সকল পরিচিত জনের কাছে বাংলাদেশ ও এখানকার মানুষ সম্পর্কে উচ্চকণ্ঠে প্রচার করে বেড়াতেন। এ দেশ থেকে যাওয়ার সময় নিয়ে যেতেন বেশুমার বই। উপহার পাওয়া 'বাংলাদেশ' লেখা জামা পরে সারা কোলকাতার পথে ঘুরে বেড়াতেন এই বিদ্যানুরাগী, জ্ঞান পিপাসু সহজিয়া মানুষটি। কখনো বিনয়ের হাসি দিয়ে বলতেন, আমাকে তো বন্ধু-বান্ধবরা বাংলাদেশের এজেন্ট বলে। বলে, "কি ভিসা নিয়ে ভারতে এসেছিস? তোর দেশে আবার কবে ফিরছিস? ..... দাদা নাগরিকত্ব একটা না পেলে যে আর মান ইজ্জত আর থাকছে না।"

এ সবই আমার ব্যক্তিগত ইতিহাস----স্মৃতির অংশ। এতো আকিস্মিকভাবে অমিতাভদা স্মৃতির অংশ হয়ে যাবেন তা অনেকের মতো আমিও আগে বুঝিনি। দাদার হৃদপিন্ডে কিছু সমস্যা ছিলো, বৌদির মুখেই প্রথম শুনেছিলাম। দাদা আমল দিতে চাইতেন না। আমরা বার বার সর্তক হতে বলতাম। উনি বলতেন, 'ওসব কিছু না।'

এ বছরই চব্বিশে ফেব্রুয়ারি ফিরতি পথে তাঁর সাথে আমার শেষকথা হয় মোবাইলে। গ্রামীণ সেলফোনে বেনাপোল সীমান্ত থেকে কথা বললেন। সীমান্ত পেরিয়ে যাবার পর এবং শেষবার পেট্রাপোল থেকে রিং দিলেন। বললেন, "দাদা, আমি আমার স্বদেশ আর আপনার বিদেশে। আশা করছি, অল্প সময়ের মধ্যে বাড়ী পৌঁছতে পারবো। ভালো থাকুন। সম্ভব হলে কোলকাতা থেকে কথা বলবো।" তা আর তার পক্ষে সম্ভব

হয়নি। দেশে ফেরার মাস দেড়েকের মধ্যেই দেশের সীমান্ত্ম শুধু নয়, জীবনের সীমান্ত্মও পেরিয়ে অমিতাভদা চলে গেলেন----চির অচেনা এক বিদেশে। গেলেন সবাই-কে, আমাদের সবাইকে হতচকিত করে।

দিনটি ছিল আটই এপ্রিল। সেদিন সকালে আমার বাবাও পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। শোকতপ্ত অবস্থায় আছি, বাবার পরিণত বয়সের মৃত্যুর কারণে তা বোধকরি মেনেও নিয়েছি। রাত প্রায় সাড়ে এগারটায় কোলকাতা থেকে শক্তিসাধনদার ফোন এলো। জানালেন, কর্মস্থল থেকে বাসায় ফেরার পথে আজ দুপুরে দাদার বড় ধরনের হার্ট-এ্যাটাক হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে তিনি পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে যান। তীরের মতো বুকে বিদ্ধ হয়ে স্থবির করে দিলো ঘটনার আকস্মিকতা। আরো জানলাম এই মহৎ মানুষটি মৃত্যুর অনেক পূর্বেই কোলকাতা মেডিক্যাল কলেজকে চোখসহ শরীরের দানযোগ্য অংশগুলির সবই দান করে গেছেন ।

এই আমাদের অমিতাভদা, সবার প্রিয়, ভালোবাসায় সিক্ত অমিতাভদা। তাঁর এই অকাল প্রয়াণ আজো মেনে নিতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে যার জন্ম যাঁর জন্ম---- তাঁকে এতো আগে চলে যেতে হবে ক্যানো? অমিতাভদার চলে যাওয়া হয়তো চলমান এই পৃথিবীর আর দশটি সাধারণ ঘটনার মতো এক ঘটনা। তবে এই মৃত্যু তাঁর পরিবারের পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে আমার এবং তার বিরাট বন্ধুমহলের জন্য এক অসামান্য ক্ষতি। আমাদের জীবনে এ অভাব কখনো পূরণ হবার মতো নয়।

অমিতাভদাকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করতে হবে একথা কখনো ভাবিনি। কোন অভিব্যক্তিতেই তাঁকে ন্যূনতম শ্রদ্ধা জানানোর ভাষা আমার জানা নেই। তাঁর কলেজ স্ট্রীটের বাসার 'দাওয়াত'-এ আমাদের আর যাওয়ার সুযোগ হলো না। অমিতাভদা সাথে আমার কথা ছিলো সুযোগ পেলেই, বাংলার হাটে-মাঠে,স্টেশনে থেকে স্টেশনে ঘুরে বেড়াবো..... দার্জিলিং থেকে সেন্ট মার্টিন্‌স, শিলং থেকে সুন্দরবন ঘুরবো। কথা ছিল পদ্মা, মেঘনা, কর্ণফুলীর বাঁকে বাঁকে ঘুরে আমরা দু'জন আবাহমান বাংলার রূপ চোখ ভরে দেখবো। না তার আর হলো না, অমিতাভদা কথা রাখলেন না। তাঁকে জীবন সে সুযোগ দিল না। এই নাকি নিয়তি। চাওয়া-পাওয়ার দূরত্ব আর অপ্রাপ্তিই নাকি জীবন। তাঁর শূণ্যতা বহুকাল আমাকে কাঁদাবে, নি:স্ব করে রাখবে। একজন নির্ভেজাল মানুষ অকালে চলে গেলে সে শোক সামলে ওঠা আসলেই কঠিন। আর আমাদের এ পোড়া দেশে খাঁটি মানুষের যে বড়োই আকাল।

যুবায়ের হাসান (রবিন), ঢাকা, ২৭ এপ্রিল ২০০৭